RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Analysis of North Indian Musical Forms

B) KIRTON .....Contd..

কীর্তন গানের সুরের বৈশিষ্ট্য

কীর্তন গানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যার কারনে এই গান অন্যান্য ভগবত বিষয়ক গান থেকে পৃথক। কীর্তনের সুর এক বিশেষ ঢঙে রচিত। কামোদ, গৌড়ী, ভীমপলশ্রী, ধনাশ্রী, ময়ুরী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রাগে কীর্তন গাওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে ময়ুরী রাগ কীর্তনের এক বিশেষ ধরনের মিশ্র সুর, যার মধ্যে বেহাগ, খাম্বাজ এবং ঝিঁঝিঁট রাগের মিশ্রণ দেখা যায়। পন্ডিতগণ বলেন শ্রীল রূপ গোস্বামীর সময় থেকে এই বিশেষ সুর প্রচলিত। আগেকার দিনের নামকরা কীর্তন গায়ক ও সুর রচয়িতা মহাজনেরা কয়েকটি গানে অনেক ভাবনা চিন্তা করে যে সুর প্রদান করে গেছেন সেগুলি 'দাগী গান' নামে প্রচলিত হয়েছে। বিশিষ্ট সেই গানের সুরগুলিকে 'জাতসুর' বালা হয়। অভিজাত বৈষ্ণব সমাজে এই মহাজন প্রদত্ত সুরগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কোন কীর্তনিয়া যদি এই সব 'দাগী গানের' 'জাতসুর' লঙ্ঘন করেন তবে তারা কীর্তন সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে থাকেন। পন্ডিতগণ মনে করেন কীর্তনের এই জাতসুরগুলি প্রাচীন ভারতের জাতিরাগের কায়দায় অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে স্বর রচনা করে রাগের বিস্তার করা হয় রাগের সৌন্দর্যায়নের কারণে। কীর্তনেও স্বর বিস্তারের সঙ্গে ভাবের অনুকুল্য বিনা পূর্ব প্রস্তুতিতে বাক্য রচনা করে ভাবকে গভীরতর করা হয়। এতে গায়কের কবিত্ব শক্তি, স্বাতন্ত্র, তার রসজ্ঞান - লয় প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের

বিস্তারে ও তানের মাধ্যমে গায়কের গুণের পরিচয় মেলে, ‘আখর’ - এ তেমনি কীর্তনিয়ার প্রতিভার পরিচয় মেলে।

কীর্তনে আখর

হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের বিস্তারে ও তানের মাধ্যমে কোনো রাগ বা রাগিনীকে শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ করা হয়ে থাকে তেমনি কীর্তনের আসরে কোনো পদের অন্তর্নিহিত ভাবকে সরল কথায় শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ করাকে ‘আখর’ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কীর্তনে আখর হল কথার তান। এই রীতি হল কীর্তনের সর্ব্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য। কীর্তনের মাধুর্য আস্বাদনে আখর হল প্রধান সহায়।

কীর্তনে মাতন

সাধারণত সঙ্গতের ক্ষেত্রে শ্রীখোলে ‘মাতন’ পরিভাষাটি ব্যবহার হয়। মাতন অর্থে মেতে ওঠা। গায়কের প্রতিটি স্তরের আখর সংযোজনা যখন শেষ হয়ে যায় বাদকেরও লহর এবং ঘাত বাদন পরিমাপ মতন সম্পূর্ণ হয়ে আসে, তখন বিশেষ দোলন সমন্বিত বা সরল ছন্দের এক ধরনের জোরালো বাদ্য বাজিয়ে শ্রোতা সাধারণকে মাতিয়ে তোলা হয়। একেই বলে ‘মাতন’। এই মাতন থেকে একটি পর্যায়ের সমাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়ে যায়।

কীর্তনে দোহার

কীর্তনের আসরে একজন মুখ্য গায়ক বা গায়িকা থাকেন এবং তাঁকে গানে সহযোগিতা করার জন্য দুই তিনজন পার্শগায়ক বা গায়িকা থাকেন। মুলগায়ক গানের পদের ভাবের বিস্তার করে যখন আখর গায়ন করেন তখন এই পার্শ গায়কগন ঐ আখর পুনঃ পুনঃ গেয়ে মাতনে নিয়ে যায়। আবার কখনো কখনো এরা মুল গায়কের সাথে সমবেত ভাবে গলা দিয়ে পদের বিভিন্ন অংশও গেয়ে থাকেন। কীর্তনের এই পার্শগায়কদের ‘দোহার’ বলা হয়। আসরে গানের সূত্র ধরিয়ে দেওয়া , গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমিয়ে রাখা ইত্যাদি হল দোহারের কাজ।

কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা

গৌরচন্দ্রিকা অর্থে গৌর বন্দনা। রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তনের পূর্ব্বে ভূমিকা হিসেবে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয়ে থাকে। 'গৌরচন্দ্র' থেকে 'গৌরচন্দ্রিকা' কথাটির উৎপত্তি। রাধাকৃষ্ণের যে লীলা কাহিনী নিয়ে কীর্তন পরিবেশিত হবে সেই ঘটনার ছায়ারূপ শ্রী গৌরাঙ্গের জীবন কাহিনীর সাথে মিশ্রিত করে গৌরচন্দ্রিকা রচনা করা হয়। খেতুরী মহোৎসবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই গৌরচন্দ্রিকা রীতি প্রবর্তন করেন এবং লীলা কীর্তনের এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন।

কীর্তনে তালের ভুমিকা

বাংলার নিজস্ব শাস্ত্রীয় তাল বলতে 'কীর্তনাঙ্গ' তাল পদ্ধতিকে বোঝায়। এই প্রকৃতির তালগুলি সবই শ্রীখোলে বাদিত হয়। কীর্তনাঙ্গ তাল পদ্ধতি প্রাচীন মার্গ ও দেশী তাল পদ্ধতির সমন্বয় বলা যায়। এবং এটি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুস্থানী বা কর্ণাটকী পদ্ধতি থেকে মুক্ত। এটি যে বাংলার মাটি থেকেই বিকশিত হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমান হল কীর্তনাঙ্গীয় তালগুলির নাম। যেমন দাসপ্যারী, লোফা, একতালি, দোঠুকী, সোম, শশিশেখর, মদনদোলা, দশকোঁশী, তেয়ট, রূপক ইত্যাদি। এই তালগুলির গঠন ও বিন্যাস অভিনব এবং কঠোর নিয়মাবদ্ধ। এই তালে প্রাচীন তালের দশপ্রাণের মার্গ, ক্রিয়া, যতি, প্রস্তার প্রভৃতি বিষয় আজো বর্তমান।

**End of Section B.
Section A will start from next set.